গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা | ২০ - ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

দুই অভিযুক্তের জামিন ন্যায়বিচারের প্রতি জঘন্য উপহাস

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কলকাতার শিয়ালদহ আদালত যে ভাবে আর জি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক-ছাত্রী 'অভয়া'র নৃশংস হত্যা ও ধর্ষণকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দুই প্রধান অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর করল, তাতে গোটা দেশের মানুষ স্তম্ভিত ও হতবাক। এটা স্পষ্ট যে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যোগসাজশে, তাদের নির্দেশে, সিবিআই এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ চার্জশিট দাখিল করেনি। এই ঘটনা ন্যায়বিচারের প্রতি জঘন্য উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। জামিনে মুক্ত হলেও এই দুই অভিযুক্ত জনসাধারণের চোখে ঘৃণ্য অপরাধী হিসাবেই গণ্য হবেন।

আমরা জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আর জি কর ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিতে এগিয়ে এসে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

আরজিকর ঃ অভিযুক্তদের বাঁচাতে কেন্দ্র-রাজ্য যোগসাজশ

বিচার না পেলে জনগণ কিন্তু ছাড়বে না

স্তম্ভিত সারা দেশ। এ-ও কি সম্ভব! যে অন্যায়ের শাস্তি চেয়ে সারা রাজ্য, দেশ উত্তাল হয়েছে সেই অন্যায়কারীদের নামে চার্জশিটটুকু দিতে পারল না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই! এ কি তাদের শুধুই অপদার্থতা! নাকি এর পিছনে অন্য কোনও গুরুতর ষড়যন্ত্র রয়েছে? এই প্রশ্নই এখন অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার মানুষকে তাড়িত করছে।

আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ-খুনে তথ্য-প্রমাণ লোপাট ও ষড়যন্ত্রের মতো গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৯০ দিনেও সিবিআই চার্জশিট দিতে না পারায় জামিন পেয়ে গেলেন তাঁরা। অথচ প্রথম থেকেই সিবিআই বলে আসছিল যে, তদন্ত ঠিক পথেই চলছে এবং তারা যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টও প্রতিটি শুনানিতে বলেছিল, তদন্ত সঠিক পথেই চলছে। ৯০তম দিনে তার এই প্রমাণই দিল সিবিআই! সিবিআইয়ের এই চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ অভয়ার ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করা লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগ এবং প্রত্যাশাকে গভীর ভাবে আঘাত করেছে।

চিকিৎসক-ছাত্রী 'অভয়ার' ধর্ষণ-খুনের পরই প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারা বাংলা। প্রতিবাদের ঢেউ বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে, এমনকি বিদেশেও। লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। অভয়ার জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে রাতের পর রাত জেগেছেন তাঁরা, অসংখ্য সভা, বিক্ষোভ, মিছিল হয়েছে। ন্যায়বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট এবং নাগরিকরা সম্মিলিত ভাবে স্বাস্থ্য দফতর ঘেরাও করেছেন, লালবাজার ঘেরাও করেছেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র এসপ্ল্যানেডে লাগাতার অবস্থান করেছেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে ১৬ আগস্ট রাজ্য জুড়ে

চারের পাতায় দেখুন

সিবিআইকে সাদা কাগজ দিল এসইউসিআই(সি)

১৪ ডিসেম্বর সিবিআই দফতর অভিযান এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর

ভুবনেশ্বরে বিশাল শ্রমিক সমাবেশ

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের শ্রমিকবিরোধী শ্রমনীতির বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি-র ২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর ওড়িশার ভুবনেশ্বরে পিএমজি স্কোয়ারে প্রকাশ্য অধিবেশনে অংশ নেন ২০ হাজারের বেশি শ্রমিক। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর দাশগুপ্ত, কমরেডস সত্যবান, স্বপন ঘোষ, অরুণ কুমার সিং প্রমুখ। প্রধান অতিথি ছিলেন ডব্লিউএফটিইউ-এর সভাপতি কমরেড মাইকেল। প্যালেস্টাইন, নেপাল ও বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১৫-১৭ ডিসেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশনে ২৬টি রাজ্য থেকে আগত ১৩০০ প্রতিনিধি অংশ নেন।

স্থগিত নয়, মেট্রোর ভাড়াবৃদ্ধির অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বাতিল করো

জনরোষের চাপে অবশেষে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ রাতের শেষ মেট্রো ভাড়ার উপর দশ টাকা সারচার্জ বসানোর প্রস্তাব অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে। মেট্রোরেল কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা চাপানোর এই সিদ্ধান্ত রেল বোর্ডের বকলমে কেন্দ্রের মোদি সরকারেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত জনগণের উপর ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা চাপানোর এই সিদ্ধান্ত থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, জনগণকে দেশের শাসক শ্রেণি কী দৃষ্টিতে দেখে।

কোনও শাসক ন্যূনতম জনদরদি হলে প্রথমেই তার বিচারের মধ্যে থাকা উচিত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও জনসাধারণকে কতটা বেশি সুরাহা দেওয়া যায়। ভাড়া ন্যূনতম রেখে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য যতদূর বেশি দেওয়া সম্ভব সেটা হওয়া উচিত একটি জনমুখী সরকারের প্রাথমিক এবং প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সরকারের ভূমিকায় তা দেখা যাচ্ছে না। সরকার মেট্রোরেল থেকে আরও বেশি মুনাফা তোলার মতলবে নানা নামে টাকা তোলার পথে হাঁটছে। ট্যাক্সবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, রোজগারহীনতায় বা স্বল্প মজুরিতে অতি কষ্টে দিন গুজরান করা সাধারণ মানুষ

দুয়ের পাতায় দেখুন

বল্লুক-১ পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

প্রকৃত ও যোগ্য প্রাপকদের আবাস যোজনার ঘর, বয়স্কদের বার্ধক্য এবং বিধবা ভাতা, সোয়াদিঘি সহ সমস্ত নাসা খাল ও ভগ্নপ্রায় রাস্তাগুলি দ্রুত সংস্কারের দাবিতে, পঞ্চায়েত ট্যাক্সবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, এলাকায় মদ ও লটারি বন্ধে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার দাবি সহ ৮ দফা দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নোনাকুড়ি আঞ্চলিক কমিটির ডাকে ১০ ডিসেম্বর দুই শতাধিক মানুষ বিক্ষোভ দেখান ও স্মারকলিপি দেন।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের মিছিল বারুইপুরে

পিএমপিএআই (গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে বারুইপুরে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে ৫ ডিসেম্বর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিছু দিন ধরে ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তর বিভিন্ন ব্লকে গ্রামীণ চিকিৎসকদের নানা ভাবে হয়রানি করে চলেছে। এর প্রতিবাদে জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে তিন শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন রেল মাঠ থেকে মিছিল করে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের সামনে পৌঁছান।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক সত্যদেব হাজরা সহ ৮ জন প্রতিনিধি অফিসারের সঙ্গে আলোচনার জন্য যান। তাঁদের নেতৃত্ব দেন রাজ্য সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ডাঃ নীলরতন নাইয়া। ডাঃ নাইয়া সমবেত গ্রামীণ চিকিৎসকদের সামনে বক্তব্য রাখেন। ডাঃ তিমির কান্তি দাসও আলোচনা করেন।

মেট্রোর ভাড়াবৃদ্ধি

একের পাতার পর

নতুন করে আবারও মেট্রো ভাড়াবৃদ্ধির বিরোধিতা করবে এটাই স্বাভাবিক। যে জনরোষের জন্য সারচার্জ স্থগিতের সিদ্ধান্ত, তা কী উপায়ে প্রশমিত করে ভাড়াবৃদ্ধিকে সহনশীল করা যায় রেলবোর্ডের কর্তারা উর্বর মাথা খাটিয়ে উপায় বের করেছে। জনসাধারণের মনটাকে এমন ভাবে তৈরি করে দাও যাতে মূল্যবৃদ্ধিতে ভাড়াবৃদ্ধিতে রুষ্ট হবে না, বরং বলবে এটাই জরুরি ছিল। সরকারের এই হীন উদ্দেশ্য সফল করতে সক্রিয় হয়েছে এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যম।

তাদের বক্তব্য, কলকাতা মেট্রোরেল অসম্ভব রকম সস্তা। মেট্রোরেলে যারা নিয়মিত যাতায়াত করেন তারা জানেন এই সস্তা তত্ত্বের দোহাই দিয়ে কলকাতা মেট্রোতে কয়েক বছর আগে কী ভাবে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে এবং স্মার্ট কার্ডের বোনাস কমিয়েছে। দশ-বারো বছর আগেও স্মার্ট কার্ডে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হত। এই বোনাস দিয়েও মেট্রো বিপুল মুনাফা করেছে। পরে বোনাস কমাতে কমাতে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা হল। সম্প্রতি তা আরও কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে। ভাড়া বাড়াতে স্টেজগুলিও ভাঙা হয়েছে। এতে মেট্রোর মুনাফা আরও বেড়েছে। ভাড়াবৃদ্ধির ওকালতি করে বলা হচ্ছে, দেশের অন্য শহরে মেট্রোতে ভাড়া বেশি। তাই ভাড়া বাড়াতে হবে। এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। অন্য শহরে মেট্রোতে বেশি ভাড়া নিলে সেটা অন্যায়। সেই অন্যায়কে দেখিয়ে আরেকটা অন্যায় করা চলে না। অন্য শহরে বেশি ভাড়া নিলে সেখানে কমানোর জন্য দাবি তোলা উচিত। তা না হলে চক্রবৃদ্ধিতে ভাড়ার বোঝা যাত্রীদের ঘাড়ে চাপতেই থাকবে।

দ্বিতীয় যে কথাটি তারা বলছে, 'মেট্রোর ভাড়া বাড়ুক, গোটা ব্যবস্থাটির আধুনিকীকরণ হোক এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হোক।' যারা এ ভাবে ভাবছেন তাদের পুরনো কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করা প্রয়োজন। সিপিএম সরকারের শেষ দিকে একবার ১৫ শতাংশ বাসভাড়া বাড়িয়েছিল সরকার। তখন বাস মালিকরা বলেছিল, বাসে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ৬ শতাংশ টাকা খরচ করা হবে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কী হাল ভুক্তভোগী মানুষ তা জানেন। ভাড়া বেড়েছে, স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাপারটাই কলকাতার গণপরিবহণ থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছে। আসলে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প বলে ভাড়াবৃদ্ধি করে মুনাফা বৃদ্ধিই সরকারের উদ্দেশ্য।

মেট্রো স্টেশনগুলিতে আগে অনেকগুলি টিকিট কাউন্টার খোলা থাকতো। এখন বেশিরভাগ স্টেশনে একটা টিকিট কাউন্টার খোলা থাকে। টিকিট কিনতেই ১০-১৫ মিনিট চলে যাচ্ছে। এটা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের নমুনা? যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হলে বেশি মেট্রো চালাতে হবে। দুটি মেট্রো মাঝের সময়ের ব্যবধান তিন-চার মিনিটের বেশি করা উচিত নয়। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চাইলে ট্রেন বাতিল করার পরম্পরা বন্ধ করতে হবে। এ দিকে কর্তৃপক্ষের নজর কোথায়?

তৃতীয়ত, কিছু সংবাদমাধ্যম বলছে মেট্রোর ভাড়া বাড়ানো হোক যথেষ্ট পরিমাণে এবং দিনের কিছু সময় যেমন সকাল ন'টার আগে পর্যন্ত বা দুপুর বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত সেই সময় ভাড়ার উপর ডিসকাউন্ট বা ছাড় দেওয়া হোক। এই যুক্তির মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত ধূর্তামি। মেট্রো রেলে যখন সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়— সেই অফিসটাইমে চড়া হারে ভাড়া বাড়ালেই ভিড় কমে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে, এটা শিশুসুলভ চিন্তা। আজকের দিনে দ্রুত কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানো এবং সারা দিন নানা কাজে দ্রুত চলাফেরার জন্য মেট্রো রেল শহরে একটা অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কোনও গণপরিবহণ ব্যবস্থাই উচ্চবিত্তের বিলাসের বিষয় হতে পারে না। মেট্রোর ক্ষেত্রে বর্তমানকালে এটা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। অতিরিক্ত ভাড়ায় চাপ হলেও দরিদ্র শ্রমিককেও এই পরিবহণ ব্যবহার করতেই হবে। তাতে সংসারের বাকি খরচে টান পড়ুক, ওষুধপত্র কেনা লাটে উঠুক, এই টাকা খরচ করতে সে বাধ্য! না হলে কাজ থেকে ছাঁটাই হবে। তাতে পুরো পরিবারের সম্পূর্ণ অনাহার নিশ্চিত। ফলে ভাড়া বাড়লেও ভিড় কমবে কী করে?

এ জন্যই যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে হলে মেট্রোর সংখ্যা বাড়ানো জরুরি। তা না করে মেট্রো থেকে নিম্ন আয়ের মানুষদের হঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব অত্যন্ত হীন এবং জঘন্য। কলকাতা মেট্রো শুধু ধনীদের যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়নি। ভিখারি থেকে দিনমজুর, নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সকলেরই ট্যাক্সের টাকায় এই মেট্রো গড়ে উঠেছে। এখন ধনীর বিলাসযাত্রার ব্যবস্থা করতে নানা ফন্দি চলছে। তারই অঙ্গ মেট্রো থেকে নিম্ন আয়ের মানুষদের হঠানোর ষড়যন্ত্র।

ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে চতুর্থ যে যুক্তি করা হচ্ছে তা হল, বিভিন্ন অ্যাপ নির্ভর ট্যাক্সি সংস্থা যদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাড়া নিতে পারে তা হলে মেট্রোতে না হওয়ার যুক্তি কী? প্রশ্ন হল, এই ব্যবস্থাটা কি সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত? চাহিদা বেশি থাকলেই ভাড়া বাড়ানো, দাম বাড়ানোকে নৈতিক দিক থেকে বলে কালোবাজারি করা। সেটাই এখন বাজারি ফরমুলায় 'ডায়নামিক প্রাইসিং।' মেট্রো রেলও সেই পথেই মানুষের পকেট কাটবে? আর মানুষ তা মেনে নেবে? আপাতত মেট্রো সারচার্জ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়েছে। প্রতিবাদ না থাকলে যে কোনও মুহূর্তে যাত্রীদের উপর ভাড়া বৃদ্ধির বোঝা চাপবে। যারা নিত্যযাত্রী এ ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিটি স্টেশনে যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে সংগঠিতভাবে বর্ধিত ভাড়ার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাতিলের দাবি জানাতে হবে।

জীবনাবসান

উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ফজলুল হক ৯ নভেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের পুঁথিমারি গ্রামে পৈতৃক ভিটা কমরেড ফজলুল হকের। ১৯৬৬ সালে দলের সাথে তিনি যুক্ত হন। ১৯৭৩-৭৪ সালে তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির চুনামারী গ্রামে চলে আসেন। ফরাক্কা থেকে আহিরণ পর্যন্ত ক্যানেল তৈরির সময়ে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহের নেতৃত্বে সেখানে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। সেই সময় তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য প্রত্যক্ষভাবে শোনার পর তিনি গরিব বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। করণদিঘিতে নিজ উদ্যোগে বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের কাজ শুরু করেন। ঘোড়ায় টানা গাড়ি টমটম চালকদের নিয়ে ইউনিয়ন করেন। নিজের সন্তানদের দলের আদর্শ নিয়ে চলার জন্য এগিয়ে দিয়েছেন। অসুস্থতার মধ্যেও নিয়মিত গণদাবী পত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন, স্থানীয় কমরেডদের থেকে দলের আন্দোলনের খবরাখবর নিতেন। দলের অগ্রগতির কথা শুনলে খুব খুশি হতেন। তিনি বলতেন বাড়ি যেমন আমার সংসার, পার্টিটাও আমার সংসার। দলের চাঁদা সামর্থ্যের থেকেও বেশি দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কমরেড ফজলুল হক দলের আদর্শের উপলব্ধি থেকেই ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ় মানসিকতা পোষণ করতেন। এই প্রশ্নে অনেক সামাজিক চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি আপস করেননি। অসুস্থ থাকার কারণে দীর্ঘদিন তিনি গণআন্দোলনগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের প্রতি নিষ্ঠা এবং আনুগত্য রেখে চলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েই জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সনাতন দত্ত সহ অন্য কমরেডরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

২৫ নভেম্বর কমরেড ফজলুল হকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় রহটপুর দৌমহোনা হাই মাদ্রাসায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক এবং জেলার নেতৃবৃন্দ, প্রয়াত কমরেডের পুত্র ও পুত্রবধূ সহ এলাকার বহু মানুষ। তাঁরা তাঁর জীবন সংগ্রামের অনুসরণীয় বহু দিক তুলে ধরেন।

কমরেড ফজলুল হক লাল সেলাম

ট্যাক্স চাপানোর প্রতিবাদ

পঞ্চায়েত দফতর ঘেরাও

সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক ব্লকের নীলকুণ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত উপবিধি কার্যকর করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘর-বাড়ি সহ ব্যক্তিসম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্যের ২-৬ শতাংশ ট্যাক্স নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ফর্ম বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়। পরিবারের প্রধানের স্বাক্ষর সহ ফর্মটি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন পঞ্চায়েত প্রধান। বিষয়টি জানার পর এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ইতিমধ্যে এলাকার মানুষ গঠন করেছেন 'গৃহসম্পত্তি করবিরোধী নাগরিক কমিটি'। ২৬ নভেম্বর স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিয়ে ট্যাক্স চাপানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

কমিটির সভাপতি নিমাই মহিষ এবং যুগ্ম সম্পাদক পরেশচন্দ্র আদক ও নারায়ণ সিংহ বলেন, গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আর্থিক অনটনের মধ্যে কোনও রকম দিনযাপন করছে। তার ওপর এই ধরনের করের বোঝা চাপালে সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়বে।

আইন তো আছে
শিশু নির্যাতন কমছে কই

পকসো আইন অনুযায়ী বারুইপুরের বিশেষ আদালত জয়নগরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ধৃতের সাজা ঘোষণা করেছে ৬৩ দিনের মাথায়। এই রায় যে একটি বিশেষ ঘটনা তা রাজ্য পুলিশ তাদের এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে কার্যত স্বীকার করে নিয়ে লিখেছে— 'এই রায় নজিরবিহীন। নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় ঘটনার মাত্র ৬৩ দিনের মধ্যে অভিযুক্তের ফাঁসির আদেশ এর আগে পশ্চিমবঙ্গে কখনও ঘটেনি। এই মামলার তদন্তে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যত দ্রুত সম্ভব নির্যাতিতা এবং তার পরিবারকে ন্যায়বিচার দেওয়া।' প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য পুলিশ ন্যায়বিচারের জন্য এত যদি আন্তরিক, তবে শুরুতেই তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠল কেন? কেন মেয়েটির পরিবারকে এ থানা ও থানা দৌড়ে বেড়াতে হয়েছিল? আর জি করের বর্বরোচিত ঘটনায় বিচারের প্রশ্নে পুলিশের কী ভূমিকা?

শুধু জয়নগরের ঘটনায় নয়, রাজ্যের সর্বত্রই বহু ক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। এটাই যে এখন স্বাভাবিক, পুলিশের তৎপরতাটাই ব্যতিক্রম— সাধারণ মানুষের সে অভিজ্ঞতা আছে। অভিযোগ উঠছে অপরাধী প্রভাবশালী না হলে সে ক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসন বিচারব্যবস্থা যে কড়া অবস্থান নেয়, প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে তাদের সেই দৃঢ়তা যায় কোথায়? জয়নগরের ঘটনায় তদন্ত ও বিচারের 'নজিরবিহীন' বিষয়টিকে সামনে রেখে রাজ্য পুলিশ-প্রশাসন ও সরকার চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাইলেও প্রশ্নগুলো এড়াতে পারছে না।

রাজ্যে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই) এবং কলকাতা পুলিশের করা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গত দু'বছরে এই রাজ্যে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের অভিযোগ বেড়েছে (যা জমা পড়েছে) যথাক্রমে ১৮ ও ১২ শতাংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) রিপোর্ট বলছে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং রাজস্থানের মতো পশ্চিমবঙ্গেও ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে শিশুদের উপর যৌন অত্যাচার বেড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে হিসেব ধরলে ২০২২ সাল পর্যন্ত শিশুদের উপর যৌন অত্যাচার বেড়েছে প্রায় ৮১ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে অপরাধ ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু পকসো আইন তো আছে। এই প্রতিটি ঘটনায় পকসো আইন কার্যকর করে এফআইআর দায়েরের দু'মাসের মধ্যে তদন্ত ও ছয় মাসের মধ্যে বিচার শেষ করে কঠোর শাস্তি দেওয়ার কাজটা বাস্তবে কি দাঁড়াচ্ছে? কেন এতদিন পশ্চিমবঙ্গে পকসো আইন বলবৎ করে শিশু নির্যাতনকারীদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তি বিধান করা গেল না? শুধুমাত্র জয়নগরের ঘটনায় বিচারের বিষয়টিকে সামনে রেখে যদি রাজ্য পুলিশ-প্রশাসন ও সরকার নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে চায় তা হলে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠবে—নারী ও শিশু নির্যাতনের আরও বহুদিনের বহু বিচারহীন ঘটনাকে কেন এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে? একটি ঘটনাকে সামনে রেখে বাকিগুলিকে কি আড়াল করতে চাওয়া হচ্ছে? জয়নগরের বিচার যে ব্যতিক্রম তা পুলিশই বলেছে। আর এটাকেই দেখিয়ে আর জি করের ঘটনায় ব্যাপক গণবিক্ষোভকে কি কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে চাওয়া হচ্ছে?

২০০৯ সালে জাতিসংঘের কনভেনশনে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন দূর করা সংক্রান্ত এক প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে ভারত। ২০১২ সালে দেশে পকসো (প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস) আইন পাস হয়। ২০১৯-এ এই আইনের সংশোধনীও নিয়ে আসা হয়। লিঙ্গ নির্বিশেষে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে অপরাধীদের দ্রুত ও কঠোরতম শাস্তির বিধান দিয়েছে পকসো আইন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান বলছে ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শিশুদের উপর যৌন অত্যাচারের মোট অভিযোগ দায়ের হয়েছে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৪৯টি। চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই) এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড চিলড্রেন (এনসিএমসি) সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে অনলাইনে চাইল্ড পর্নোগ্রাফির প্রসারে এই মুহূর্তে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থানে। গোটা দেশে শিশু নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান এই প্রবণতার প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত কতজন অপরাধীকে পকসো আইনের আওতায় এনে দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে?

হিসেব মেলাতে গেলে কানাগলিতে পড়তে হবে। বরং চোখের সামনে উদাহরণ হিসেবে মনে পড়ে যাবে কাশ্মীরের কাঠুয়ার ঘটনা, উত্তরপ্রদেশের উন্নাও-এর মতো ঘটনা। কাঠুয়াতে আট বছরের আসিফা বানোকে মন্দিরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিল যারা তাদের সমর্থনে দেশের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল করেছে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় আসীন বিজেপির নেতাকর্মীরা। উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার, তার ভাই ও অন্য সহযোগী মিলে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। বিচার চাওয়াতে মেয়েটি ও তার পরিবারকে বারবার নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় নাবালিকার বাবাকে। এতেই বোঝা যায় এই দেশে, এই রাজ্যে অপরাধীদের শাস্তি কেন ব্যতিক্রমী ঘটনা। যেখানে পুলিশ-প্রশাসন-বিচারব্যবস্থা সবই রাজনীতির কারবারিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে দুর্বৃত্তদের আশ্রয়স্থল হয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি, সেখানে আইনে ভালো ভালো কথা লেখা থাকলেও প্রকৃত অর্থে ন্যায়বিচার সম্ভব কি?

শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের প্রশ্নে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ অভিভাবকদের সতর্ক হতে পরামর্শ দিচ্ছেন। বলছেন, 'পরিবারে

সাতের পাতায় দেখুন

সাম্প্রদায়িক মতলবেই সম্ভলে সমীক্ষার ফরমান

এখন এ দেশে, বিশেষত বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে নিম্ন আদালতের কাজ কি মন্দির-মসজিদ বিতর্কে ইন্ধন দেওয়া? তা না হলে উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের স্থানীয় আদালত কী করে একজন মাত্র আবেদনকারীর বক্তব্য শুনেই অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেখানকার শাহী মসজিদের নিচে মন্দির খোঁজার জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু করার নির্দেশ দিতে পারে? এর পরিণতিতে অশান্তি সৃষ্টি হলে পাঁচজন মানুষ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন। অথচ এই শাহী মসজিদ ভারত সরকারের নথিতে 'ন্যাশনাল মনুমেন্ট' হিসেবে স্বীকৃত, যা বর্তমানে টিকে থাকা ধর্মস্থানগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যগুলির অন্যতম।

এক পুরোহিত স্থানীয় আদালতে আবেদন করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস, এই মসজিদ নাকি বাবরের আমলে হরিহর মন্দির ভেঙে তৈরি হয়েছিল। এ দেশে এখন বিশ্বাসই যে ইতিহাস, বাস্তব, সত্যের উপরে স্থান পেতে পারে, তার নজির গড়ে রেখেছে বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির মামলায় খোদ সুপ্রিম কোর্ট। ফলে অন্য পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য এতটুকু অপেক্ষা না করেই কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমীক্ষা শুরু করাতে আদালতকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি। ন্যায়বিচার তো অনেক দূরের বিষয়, এটা আদৌ কোনও বিচার বলেও কি বিবেচিত হতে পারে! যদিও বর্তমান ভারতে বিচারালয়গুলিতে প্রভাবশালী মহলের কাছে নতি স্বীকার না করা এবং অন্তত কিছুটা অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ বিচারক, এমনকি তেমন আইনজীবীর দেখা পাওয়াও বেশ বিরল ঘটনা হয়ে উঠছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ ১৯৯১-এর উপাসনাস্থল সংক্রান্ত আইনের উল্লেখ করে নানা মসজিদে চলা এই ধরনের সমস্ত সমীক্ষা আপাতত বন্ধ রাখতে বলেছে। অবশ্য মসজিদের জমিতে মন্দির খোঁজার বিতর্কের প্যান্ডোরার বাক্সটির ঢাকনা আপাতত সুপ্রিম কোর্ট এঁটে দিলেও এর ভিতরের পোকাগুলি যে শীর্ষ আদালতের পুরনো কিছু রায়ে পুষ্টিলাভ করতে পেরেছে তা বললে খুব ভুল হবে না বোধহয়।

১৯৯১-এর উপাসনাস্থল আইনে বলা হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় কোনও ধর্মস্থানের চরিত্র যা ছিল তাকে এখন আর পাল্টানো যাবে না। সুস্পষ্ট এই নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও ২০১৯-এ সুপ্রিম কোর্টে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের বিষয়টিকে এই আইনের বাইরে আনা হয়েছিল। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়ার নামে সেই দিন কেন একটা আইনের ব্যতিক্রম ঘটানো হল, কেনই বা সংবিধানে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতারও ধার ধারল না দেশের সর্বোচ্চ আদালত— সেই প্রশ্নে আলোড়িত হয়েছিল দেশ। কিছুদিন পরেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ যখন রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করলেন, দেশবাসীর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠল, এটা কি তাঁর বিশেষ পুরস্কার! বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান, ইতিহাস, যুক্তি, এমনকি আইন সমস্ত কিছুর ওপরে এক দল মানুষের বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে সেদিন বিচারের নীতিকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থে শাসকদল বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের অ্যাজেন্ডা চরিতার্থ হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে প্রশাসনে, বিচারালয়ে আজও যতটুকু ধর্মনিরপেক্ষতা টিকে আছে তা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে ২০২২-এ জ্ঞানবাপী মামলার শুনানির সময়, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি শাহি ঈদগা বা মধ্যপ্রদেশের কামাল-মওলা মসজিদের ক্ষেত্রে। দেখে মনে হয় যেন মসজিদের নিচে মন্দির ছিল, এই ধুয়ো তুলে আদালতে একবার মামলা করে ফেলতে পারলেই হল— আর কোনও সমস্যা নেই। এরপর হিন্দুত্ববাদীরা যেমনটি চায় আদালতে ঠিক তেমনটি ঘটতে থাকবে। আর বিজেপি এই ইস্যুটিকে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাবাবেগের দোহাই দিয়ে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে পারবে।

অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার সময় দেশের শীর্ষ আদালত ঘোষণা করেছিল, ১৯৯১-এর উপাসনাস্থল আইন আর কখনও লঙ্ঘিত হবে না। অথচ জ্ঞানবাপী মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট সমীক্ষার নির্দেশ দিলে সর্বোচ্চ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় সেদিন তাতে স্থগিতাদেশ দেননি। এমনকি জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজো করার নির্দেশেও ছাড়পত্র তিনি দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিশ্বাসই ছিল অজুহাত। জ্ঞানবাপী মামলায় বিচারপতি চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেছিলেন, ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইনে নাকি উপাসনাস্থলের পুরনো চরিত্র নির্ধারণে সমীক্ষা চালাতে কোনও বাধা নেই। অবশ্য তিনি সম্প্রতি বলেছেন, এটা ছিল কেবলমাত্র মন্তব্য, একে রায়ের অংশ হিসাবে ধরার কারণ নেই। অথচ এই মন্তব্যের ভিত্তিতেই জ্ঞানবাপীতে পুজোপাঠ থেকে সমীক্ষা সবই চলতে দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করতে গিয়ে বিচারব্যবস্থা যখন সংখ্যালঘু অংশের আস্থা হারিয়ে ফেলে, তাকে কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যায়? আসলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের স্থায়ী মীমাংসার জন্যই ভেঙে দেওয়া বাবরি মসজিদের জমিতেই রাম মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত— এ কথা বলা হলেও, এর মধ্য দিয়ে সেদিন সাম্প্রদায়িক বিভেদের যে বিষবৃক্ষ পোঁতা হয়েছে, তা আরও ডালপালা মেলেছে। এই পথ বেয়েই একটার পর একটা রাজ্যে বিজেপি ভোটের স্বার্থে মসজিদের নিচে মন্দির খোঁজার বাহানায় তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পুষ্ট করতে পারছে।

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, শোষক ও শোষিতে বিভক্ত এই

সাতের পাতায় দেখুন

দুই অভিযুক্তের জামিন

একের পাতার পর

ধর্মঘট পালিত হয়েছে। আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা অতীতের সমস্ত নজির ছাড়িয়ে গেছে। সেই জনমতকে উপেক্ষা করেই চার্জশিট না দিয়ে মূল দুই অভিযুক্তকে জামিন পেতে সুবিধা করে দিল সিবিআই। সিবিবিআইয়ের এই ভূমিকায় সমস্ত অংশের মানুষ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ। সর্বত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়ছে মানুষ। প্রতিবাদে নতুন করে রাস্তায় নামছে।

জামিনের সংবাদ প্রচার হতেই আর জি করের আন্দোলনরত চিকিৎসক, ছাত্র এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁদের তীব্র ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। পরদিন সিবিআই দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট, এমএসসি, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম এবং নার্সেস ইউনিটির সদস্যরা। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যোগসাজশ এবং তাদের নির্দেশেই সিবিআই চার্জশিট না দেওয়ার ঘটনা বলে জানিয়েছেন। তিনি এই ঘটনাকে ন্যায়বিচারের প্রতি জঘন্য উপহাস বলে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। ১৫ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে সিবিআই দফতর অভিযান করে স্মারকলিপি হিসাবে সাদা কাগজ জমা দেওয়া হয়। রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, সিবিআইকে নতুন করে রাজ্যের মানুষের আর বলার কিছু নেই। এর আগে অনেক বার আমরা সিবিআই দফতরে এসে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। প্রতিবার সিবিআই জানিয়েছে তদন্ত ঠিক পথেই চলছে। এই কি ঠিক পথে তদন্তের নমুনা?

কেন্দ্র-রাজ্য বোঝাপড়া

সমস্ত স্তরের মানুষের মনে আজ এই প্রশ্ন ঘা দিচ্ছে যে, চার্জশিট দিতে না পারা কি শুধুই সিবিআয়ের অপদার্থতা, নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র? তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পরে সিবিআই নিজেই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ জানিয়েছিল এবং প্রথমে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হলেও পরে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে তারা। চিকিৎসক-ছাত্রীর মৃত্যুর দিন সকাল থেকে প্রথমে সেটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা এবং তারপর সারাদিন ধরে সমস্ত

১৪ ডিসেম্বর সিবিআই দফতর অভিযান

তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার কাজে কী ভাবে গোটা হাসপাতাল-প্রশাসন যুক্ত হয়ে পড়েছিল, নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে ময়নাতদন্তের নামে কেমন প্রহসন হয়েছে, কী ভাবে অতি দ্রুততায় মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে পুনরায় ময়নাতদন্তের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্রের তথ্যপ্রমাণ লোপাট করতে হাসপাতালের সব সিসি ক্যামেরার রেকর্ড এবং সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে প্রভাবশালীদের ফোনের সব নথি মুছে ফেলা হয়েছিল। সেগুলি উদ্ধার করতে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির সাহায্য নিতে হয়েছিল সিবিআইকে। তথ্য-প্রমাণ লোপাটের এই গোটা কাজটি করা হয়েছিল রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং এক নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক। এই গোটা কর্মকাণ্ডের পিছনে মূল ভূমিকায় ছিলেন আর জি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং ওই ওসি। এ ছাড়াও তদন্তে সিবিআই বহু জনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং জানায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটে এবং খুন-ধর্ষণে জড়িত থাকার অনেক প্রমাণ তারা জোগাড় করতে পেরেছে। তা হলে তো তাদের চার্জশিট জমা দিতে না পারার কথা নয়। তবে তারা তা পারল না কেন? জনমনে এ অভিযোগ দৃঢ়মূল যে, অভিযুক্ত দু'জনকে জামিন করিয়ে দিতে সিবিআই ইচ্ছাকৃত ভাবে চার্জশিট জমা দিল না। ন্যায়বিচারের উপর এ এক নিষ্ঠুর আঘাত।

অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়ার সময়েই সিবিআই জানিয়েছিল পরে তারা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেবে। তাতে অন্য সন্দেহভাজনদের তারা যুক্ত করবে। তা হলে সেই চার্জশিট তারা জমা দিল না কেন? একটি কলেজ-হাসপাতালে ঢুকে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার একজন চিকিৎসক-ছাত্রীকে ধর্ষণ করল, তার সাথে প্রবল ধস্তাধস্তি হল এবং তাকে খুন করে আধ ঘণ্টার মধ্যে নিরাপদে বেরিয়ে গেল, এ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য কি? এত ঘটনা একার পক্ষে সম্ভব কি? তা হলে আর কারা ছিল? তদন্ত করে বের করার দায়িত্ব ছিল সিবিআইয়ের। তারা তা করল না কেন?

সুপ্রিম কোর্ট আর জি কর ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই মামলা শোনার দায়িত্ব নিয়েছিল। প্রথম দিনের শুনানিতে সিবিআই আইনজীবীর রিপোর্ট দেখে প্রধান বিচারপতি চমকে উঠে বলেছিলেন, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। বলেছিলেন, সিবিআই তদন্ত করছে। নিশ্চয় সমস্তটা সামনে আসবে। এই কি তা হলে সেই ভয়াবহ খুনের সিবিআই তদন্তের পরিণাম! সুপ্রিম কোর্ট তা হলে কী দায়িত্ব পালন করল? নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের এক আইনজীবী যে বলেছিলেন, দেশ জুড়ে চিকিৎসকদের আন্দোলন যে ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, সুপ্রিম কোর্ট দায়িত্ব না নিলে তা তীব্র হয়ে উঠত— বাস্তবে সেই আন্দোলন আটকানোই ছিল সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্য, সত্য উদঘাটন নয়?

সিবিআই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অধীন। তা হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন সিবিআইয়ের এই ভূমিকার পরও নীরব? ঘটনার পরপরই স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরে তিনি আর জি করের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, "মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনার যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত দরকার। যারা এই দানবীয় কাজে জড়িত, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার। এতে সমাজে আস্থা তৈরি হবে" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ আগস্ট)।

প্রধানমন্ত্রী কি বলবেন, সিবিআইয়ের এই ভূমিকা সমাজে সত্যিই আস্থা তৈরি করল, নাকি ন্যায়বিচার সম্পর্কে, সিবিআই সম্পর্কে সমাজ জুড়ে প্রবল অনাস্থা তৈরি করল? আর সেই অনাস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দফতর কি দায়িত্ব এড়াতে পারে?

খাঁচার তোতা সিবিআই

অতীতেও বারে বারে দেখা গেছে, সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার পরও তারা যথাযথ তদন্ত করেনি। যা দেখে এমনকি বিচারপতিরা পর্যন্ত বিরক্তির সুরে তাদের বারে বারে 'খাঁচার তোতা' বলেছেন। অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে তদন্ত নয়, ওপর মহল যেমন নির্দেশ দেয় সেই মতোই তারা কাজ করে। বিজেপি শাসনে আজ এ কথা সবারই জানা যে, কেন্দ্রীয় সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হিসাব কষেই এই নির্দেশ দিয়ে থাকে। এমন তদন্তের উপর দাঁড়িয়ে শাসকদের স্বার্থ চরিতার্থ হলেও মানুষ ন্যায়বিচার পেতে পারে কি?

২০১৪ সাল থেকে সারদা চিটফান্ড দুর্নীতি সহ প্রায় ডজনখানেক যে বড় দুর্নীতির মামলার দায়িত্ব সিবিআই নিয়েছে, তার কোনওটিরই তারা ফয়সালা করতে পারেনি। তা কি এই জন্য যে, এগুলির সবকটিতেই কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলগুলির নানা স্তরের নেতারা জড়িত? এ বারও সিবিআইয়ের সঞ্জয় রায়কেই দোষী সাব্যস্ত করে কার্যত পুলিশের রিপোর্টটিতেই স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া এবং চার্জশিট জমা না দেওয়ার ঘটনায় একই অভিযোগ উঠছে যে, সিবিআই রাজনৈতিক নির্দেশেই এ ভাবে হাত গুটিয়ে থাকল। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তো আপাতদৃষ্টিতে তৃণমূলের বন্ধু সরকার নয়, তা হলে তৃণমূল সরকারকে বাঁচাতে কেন বিজেপি সরকার সিবিআইকে এ ভাবে হাত গুটিয়ে থাকতে নির্দেশ দেবে?

বিচার আটকাতে উভয় সরকারের সমস্বার্থ

আর জি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ-খুনের ঘটনাটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। এর নৃশংসতা যেমন মানুষকে স্তম্ভিত করেছে, তেমনই এর পিছনে যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে, একটা বিরাট দুর্নীতি-চক্র এবং থ্রেট কালচার কাজ করেছে এবং এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত রয়েছে, গত চার মাসের তদন্তে প্রকাশিত খবরগুলি থেকে সকলের কাছেই আজ তা স্পষ্ট। তাই তদন্ত সঠিক পথে এগোলে এই বিরাট চক্রটি প্রকাশ্যে এসে যাওয়ার আশঙ্কা যেমন রাজ্য সরকারের, তেমনই এই ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে যে নজিরবিহীন গণআন্দোলন দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে তা যদি সফল পরিণতিতে পৌঁছায়, দাবি আদায় করতে পারে, কেন্দ্র-রাজ্য উভয় শাসকদের আশঙ্কা, তার দেশজোড়া বিরাট প্রভাব পড়বে। সর্বত্র তা শোষিত নিপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। যেখানেই অন্যায় ঘটবে সেখানেই আর জি কর আন্দোলনের মতো মানুষ ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামবে, আন্দোলন গড়ে তুলবে। শাসকদের বাধ্য করবে দাবি মানতে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনও শাসকই তা চাইতে পারে না। এইখানেই রাজ্যের তৃণমূল শাসকদের সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি শাসকদের স্বার্থ এক বিন্দুতে মিলেছে।

১৪ ডিসেম্বর জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের আহ্বানে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের সিবিআই দফতর অভিযান

তৃণমূল সরকারের নিকৃষ্ট ভূমিকা

তৃণমূল সরকার তার নিজ স্বার্থেই তদন্তকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছে। প্রথম থেকেই তৃণমূল সরকার এক সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেই একমাত্র দোষী হিসাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। এবং তাকে গ্রেফতার করাকেই তাদের বিরাট কীর্তি হিসাবে দেখাতে চেয়েছে। সরকার জানে তদন্ত যদি সঠিক পথে হয় তবে শুধু তাদের নানা স্তরের নেতাদের দুর্নীতিই প্রকাশ্যে এসে পড়বে তাই নয়, এই ধর্ষণ-খুনের ঘটনায়ও সেই সব রাঘব বোয়ালদের যোগসাজশও প্রকাশ্যে এসে যাবে। তাই সন্দীপ ঘোষকে আড়াল করতে সরকার সব রকমের চেষ্টা চালিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ডাক্তার এবং ছাত্ররা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লে রাজ্য সরকার তাঁকে আর একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ করে পাঠানোর মতো ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। আজও পর্যন্ত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। সিবিআইয়ের সঙ্গেও সরকার প্রথম থেকেই অসহযোগিতা করে এসেছে। তৃণমূল সরকার যদি সত্যিই ন্যায়বিচার চাইত, তবে এতবড় একটি গণআন্দোলনের দাবি এমন করে উপেক্ষা করতে পারত না। আন্দোলনে পদে পদে বাধা দিত না, তদন্তে অসহযোগিতা করত না। তৃণমূল সরকার যদি দায়িত্বশীল হত, জনগণের প্রতি যদি তাদের দায়বদ্ধতা থাকত তবে তারাও জনগণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সিবিআইয়ের কাছে দ্রুত তদন্তের দাবি জানাত। সরকারের কথা ছেড়ে দিলেও দল হিসাবে তৃণমূলও তা করেনি। শুধু তাই নয়, সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল সরকারি কর্মচারী হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে গেলে রাজ্য সরকারের যে অনুমতি লাগে, সিবিআই জানিয়েছে তা-ও সরকার দেয়নি।

সত্য উদঘাটনে বিজেপি নেতাদের অনীহা

রাজ্যের বিজেপি নেতারা আর জি কর আন্দোলনের বিরাট ব্যাপ্তি দেখে প্রথম দিকে কিছু কর্মসূচি নিলেও যখন বুঝলেন, এই আন্দোলনকে দাবি আদায়ের রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সরকার

আটের পাতায় দেখুন

‘সঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছি’

বলে গেলেন এআইডিএসও সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিরা

২৭ নভেম্বর। ভোরের দিল্লি তখন ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে হাল্কা শীতের আমেজে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে। আর ধীরে ধীরে সেজে উঠছে দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়াম। কয়েক ঘণ্টা পরেই শুরু হবে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র দশম সর্বভারতীয় সম্মেলন। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি প্রতিরোধে, দেশের সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাবার লক্ষ্যে আগামী দিনের রণকৌশল স্থির করতেই এই সম্মেলন। দেশের ২৯টি রাজ্য ও চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিশাল ছাত্র-জনতার প্রতিনিধিত্ব করতে প্রতিনিধিরা এক এক করে উপস্থিত হচ্ছেন ‘শহিদ উধম সিং নগরে’। এই সম্মেলন কোনও আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়। প্রকৃত অর্থেই দেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে আদর্শগত চেতনার ভিত্তিতে এক ছাতার তলায় সমবেত করার মঞ্চ এই সম্মেলন। ‘নানা ভাষা-নানা মত-নানা পরিধানের’ বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে উঠে আসা এক একজন প্রতিনিধি এখানে বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর পরিবারের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব বুঝে নিতে এসেছেন। এই আদর্শই দক্ষিণের এর্নাকুলাম থেকে আসা যতীনকে মিলিয়ে দেয় উত্তরের জলন্ধরের গুরদীপকে। আলিঙ্গনের উষ্ণতায় মিশে যায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামের পথে চলার অঙ্গীকার। পুদুচেরির দিব্যা মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমর্থনে মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখলে তার মূল কথাকে নাড়ির টানে বুঝে নিয়ে অভিবাদন জানায় পাশাপাশি বসা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের প্রতিনিধিরা, তামিলনাড়ুর সেবাস্তিয়ান চোখের জল ফেলে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি প্রশাসনের চাপানো মিথ্যা মামলায় জেল হেফাজতে থাকা অমৃকের অনুপস্থিতিতে। অরুণাচল বা উত্তরাখণ্ডের প্রতিনিধিদের পরিবেশিত আঞ্চলিক ভাষার লোকগীতির তালে দুলে ওঠে পুরো হল। এমন টুকরো টুকরো ছবি রচনা করে এক বৃহৎ ক্যানভাস।

যুগে যুগে যারা সত্যের পতাকাকে বহন করেছে তাদের রাস্তা কখনওই সুগম হয়নি, মসৃণ হয়নি। এই দশম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদেরও অনেকেরই সম্মেলনে আসার পথটা মসৃণ ছিল না। প্রতিটি প্রতিনিধির লড়াইয়ের গল্প মালার মতো গাঁথলে তা এক অনবদ্য আখ্যানের জন্ম দেয়। শুনতে শুনতে চোখ ভিজে যায়, হৃদয় মুচড়ে ওঠে, আর জমা হতে থাকে আগামী লড়াইয়ের রসদ।

ছাত্র সম্মেলনে এই প্রথমবার উপস্থিত হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুকৃতী। সে তার রাজ্যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা ও তার উন্নতির জন্য এআইডিএসও-র আন্দোলনের সম্পর্কে প্রথম জানতে পারে তার গৃহশিক্ষকের কাছে। তাঁর কাছ থেকেই সংগঠনের প্রাথমিক পাঠ সুকৃতীর। সম্মেলনের প্রতিনিধি হওয়ার প্রস্তাব সে সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু তার পরিবার কোনও মতেই রাজি ছিল না দিল্লিতে সম্মেলনে পাঠানোর জন্য। বহু তর্কবিতর্ক ঝামেলা অশান্তির পর্ব পেরিয়ে শেষে তার পরিবারের অনুমতি পেয়েছে সে। সম্মেলনের বিরতিতে ‘কেমন লাগছে’ প্রশ্ন শুনেই তার মুখের উজ্জ্বল হাসিই উত্তরটা দিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের সুনীতা খাটুয়াও ছাত্র সম্মেলনে প্রথম। কলকাতার একটা কলেজের সোসিওলজি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সুনীতার পরিবার খুবই রক্ষণশীল। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কলকাতার কলেজে পা রাখাই তাঁর জীবনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। নানা বাধার ধাপ পেরিয়ে এ বারের সম্মেলনে উপস্থিত হতে পেরে সে খুবই উৎসাহিত। হাসি মুখে বলে গেল— ভাল কাজে এসেছি। আমার কোনও ভয় নেই। ত্রিপুরা থেকে এসেছিলেন নজেন্দ্র ত্রিপুরা। সে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ত্রিপুরা থেকে দিল্লি যাতায়াতের খরচ অনেক। তার পরিবারের পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলে সম্মেলনে যাওয়া তো বন্ধ করা যায় না! তাই সে টানা দু'মাস কনস্ট্রাকশন সাইটে দিনমজুরের কাজ করে সেই টাকা সংগ্রহ করেছে। ত্রিপুরার আরও কয়েকজন প্রতিনিধি চা-শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তারা ধার করে খরচ জোগাড় করেছে। ঠিক করেছে, সম্মেলন থেকে ফিরে গিয়ে চা-বাগানে মজুরের কাজ করে ধার শোধ করবে। এ যেন জ্যাক লন্ডনের ‘দ্য মেক্সিকান’ গল্পের বক্সার চরিত্রটি, যে বক্সিং রিংয়ে মার খেয়ে অর্থ সংগ্রহ করে সংগঠনের প্রয়োজনে। গল্পের চরিত্ররা এ ভাবেই বাস্তবের সংগ্রামে মূর্ত হয়ে ওঠে। দিল্লির খুশবু এআইডিএসও-র কথা শুনেছে তার স্কুলের গেটে সম্মেলনের প্রচার চলাকালীন। ধীরে ধীরে সে সংগঠনের একজন কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মেয়ে হয়ে রাজনীতির আঙিনায় পা দেওয়া নিয়ে প্রবল আপত্তি অভিভাবকদের। স্বাভাবিকভাবেই সম্মেলনে আসার ক্ষেত্রেও আপত্তি ছিল প্রবল। কিন্তু খুশবু বোঝে, দিল্লির আরও অন্যান্য সরকারি স্কুলের মতো তার স্কুলটাও একদিন উঠে যাবে। তাই সব অশান্তির সম্ভাবনা মাথায় নিয়েই সে এসেছে সম্মেলনে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অনলাইনে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও এসইউসিআই(সি)-র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র এস বি রাজু কলেজে ছিলেন এসএফআইয়ের ইউনিট সম্পাদক। বামপন্থা, সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ থেকেই তিনি এসএফআইতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তাঁর আশাভঙ্গ হয়। ঘটনাচক্রে যোগাযোগ হয় এআইডিএসও-র সঙ্গে। বর্তমানে তিনি সংগঠনের ত্রিবান্দ্রম জেলা সম্পাদকের ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর উপলব্ধি— আমি সঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি।

মধ্যপ্রদেশের গুনা শহরে সম্মেলনের সমর্থনে প্রচার চালানোর সময় কর্মীদের ওপর নেমে আসে আরএসএস-বিজেপি আশ্রিত গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণ। এআইডিএসও কর্মীরা রুখে দাঁড়ালে বিজেপি সরকারের পুলিশ আক্রান্তদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। আট জন সংগঠক জেলে বন্দি হন। কিন্তু তাই বলে সম্মেলনের প্রচারের কাজ থেমে যায়নি। জেলে থাকা এক সংগঠকের মা বলেন, ‘আমি সকল সন্তানের হয়ে তোমাদের এই সম্মেলনের কাজে সাহায্য করব।’ ওই মধ্যপ্রদেশ থেকেই প্রায় ১০০০ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে।

দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির প্রতি দেশের সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ সেই রাজ্যের মানুষের আবেগকে আহত করেছে বারবার। কিন্তু এআইডিএসও শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আসামের পাশাপাশি মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্যগুলি থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গোটা সম্মেলনের পরিবেশ তাঁদের অভিভূত করেছে। সমস্ত প্রতিনিধির একত্রে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করার দৃশ্য তাঁদের ভাবিয়েছে। জাতি-উপজাতিগত ভেদাভেদ ভুলে এই একতার চিত্রই তাঁরা দেখতে চান। কিন্তু শাসকরা নানা চক্রান্তে তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাঁদের একজনের কথায়, আমাদের রাজ্যে কতই না বিভেদ তৈরি করে রেখেছে শাসকরা, কিন্তু এখানে আমরা এক হয়েছি শিক্ষার দাবিতে, এ যে কী আনন্দের তা বলে বোঝাতে পারব না। সম্মেলন থেকে নতুন আশার আলো বুকে নিয়ে তাঁরা ফিরে গেছেন। সংগঠনের বিস্তারের সংকল্প গ্রহণ করেছেন তাঁরা।

সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা গাইছিলেন ‘সারফারোশি কি তমান্না ... অব হামারে দিলমেঁ হ্যায়...’ গোটা হল স্তব্ধ হয়ে শুনেছে সে গান। শুধু শুনেছে না, গানের প্রতিটি শব্দকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার ভাবনায় মগ্ন হয়ে গলা মিলিয়েছে সকলে। দিল্লি রাজ্যের প্রতিনিধিরা মঞ্চে গেয়েছে বিখ্যাত কবি পাস রচিত কবিতায় সুরারোপ করে— ‘হাম লড়েঙ্গে সাথী উদাস মৌসম কে লিয়ে’। সেই সুরের ছন্দে উদ্বেলিত হয়েছে গোটা সম্মেলন স্থল। সকলেরই মনে গুঞ্জন তুলছে ‘হাম লড়েঙ্গে সাথী...’

প্রতিনিধি অধিবেশনে সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় নেতা কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—‘ফিউচার ইজ আওয়ার্স।’ এরপর সংগঠনের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যরা অভিবাদন গ্রহণ করল আগামীর লড়াইয়ের শপথ নিয়ে। সমাপ্তি অধিবেশনে সংগঠনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ভিডিও বার্তায় সকল প্রতিনিধিদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করে এই সময়ে করণীয় কর্তব্য তুলে ধরছেন যখন, সকলে গভীর মনোযোগে তাকে ধারণ করছেন। বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিকে পাল্টে ফেলার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন— “পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য আজ প্রয়োজন আজকের দিনের অসংখ্য শহিদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আজাদ, আশফাকুল্লাহ, প্রীতিলতা। যারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তা গ্রহণ করে নতুন মানুষ হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার সংগ্রামে শামিল হবে।” তাঁর এই উদাত্ত আহ্বানে সকল প্রতিনিধির বুকে অনুরণিত হয়েছে— ‘হাম লড়েঙ্গে ... হাম জিতেঙ্গে।’

আর জি করের নৃশংস ঘটনায় অভিযুক্ত হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে

১৪ ডিসেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় এসইউসিআই(সি) কেন্দ্রীয় কমিটি। • ছবি ঃ বাঁ দিক থেকে - ছত্তিশগড়ের দুর্গ, ত্রিপুরার আগরতলা, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার।

পাঠকের মতামত

মেট্রোকে কিছু সাদা কলারের বাহন না করাই শ্রেয়

রাতের শেষ মেট্রোর ভাড়ার উপরে ১০ টাকা সারচার্জ বসানোর প্রস্তাব করেছিল কলকাতা মেট্রো রেল। তাতে যাত্রীদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তা একান্তই ন্যায্য। রাত গড়ালেই মেট্রোয় দু'টি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বাড়ে, মাঝেমধ্যে বাতিলও হয়ে যায় ট্রেন। সবচেয়ে সমস্যার বিষয় রাত দশটা নাগাদ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় বলে অনেককেই হুড়মুড় করে ছুটতে হয় শেষ ট্রেনটি ধরার জন্য। এ ছাড়াও, সব স্টেশনে পানীয় জল নেই, এসকেলেটর নেই। ফলে, বয়স্কদের এবং অসুস্থদের অশেষ কষ্টভোগ করতে হয়। এই সব দিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কর্তৃপক্ষের। পরিষেবা যথাযথ করা দরকার এবং ট্রেন অন্তত এগারোটা অবধি চালু থাকা দরকার।

উপচে পড়া ভিড় সব ট্রেনে হতেই হবে, না হলে ট্রেন চালানোই বন্ধ করে দেওয়া হবে— এটা কোনও সুস্থ সমাজের রীতি হতে পারে না। কোনও সময় যাত্রীসংখ্যা কম হতেই পারে। কিন্তু, তার জন্য সারচার্জ আরোপ করা বা ভাড়া বাড়ানোর কথা উঠবে কেন? গণপরিবহণ ব্যবস্থা কি বড়বাজারের গদি না কি যে, পাই পয়সার জন্য যাত্রীদের পকেট খামচে ধরবে?

মেট্রো রেলের প্রয়োজনটা দেখা দিয়েছিল কেন? উনিশ শতকের লন্ডনের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, এর দরকার হয়েছিল গণপরিবহণকে আরও দ্রুত এবং সময়ানুবর্তী করে শহরের কর্মব্যস্ততাকে সজীব করে তোলা। শহরের নানা প্রান্তের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ যাতে ঝট করে গন্তব্যে বা কর্মস্থলে পৌঁছে যেতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিতে যাতে ছেদ না পড়ে, দ্রুততর এবং সময়ানুবর্তী গণপরিবহণ হিসেবে সেটাই হল মেট্রো রেলের কার্যকারিতা। কলকাতাতেও তাই। এই প্রধান লক্ষ্য ছেঁটে ফেলে সরকারি অর্থ ব্যয় করে কিছু সাদা কলারকে বয়ে বেড়ানো মেট্রোর উদ্দেশ্য হতে পারে কি?

এমনিতেই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির দাপটে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার মানসিকতা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

কেউ কেউ উপদেশ দিচ্ছেন, বেশি ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে বিদেশের কৌশল নিতে। বলা হচ্ছে, বিশ্বের প্রায় সব আধুনিক শহরেই ব্যস্ততার সময়ে গণপরিবহণে এক রকম ভাড়া, ফাঁকা সময়ে অন্য রকম। অথচ, তারা এ কথাটা বলছেন না যে, সেসব শহরে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় ভাড়াই দিতে হয় না। কিছু ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ও দেওয়া হয়। অন্যান্যদেরও নানা সুবিধা দেওয়া হয়। সে সব এখানে চালু করা যায় কি না ভাবা দরকার। আমার মতে, কলকাতা মেট্রোর ভাড়া যদি বাড়াতেই হয় তা হলে ইনকাম সার্টিফিকেট দেখে বাড়ানোর পদ্ধতি চালু হোক। যারা বেশি ভাড়া দিতে পারে তারা স্বেচ্ছায় দিক। যাদের রোজগার তেমন নয় তারা যাতে পাঁচ টাকারও কমে মেট্রোয় উঠতে পারে তার ব্যবস্থা সরকার করুক। কারণ, পরিসংখ্যান মন্ত্রক সম্প্রতি ২০২২-২৩ সালের 'পারিবারিক কেনাকাটার খরচ সমীক্ষা'র প্রাথমিক কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। সেই হিসাব অনুযায়ী, দেশের গ্রামাঞ্চলে গড়ে মাথা পিছু মাসিক খরচের পরিমাণ মাত্র ৩৭৭৩ টাকা। শহরাঞ্চলে ৬৪৫৯ টাকা। আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা গ্রামাঞ্চলে মাসে ৩২৩৯ টাকা, শহরে ৫২৬৭ টাকা। অর্থাৎ গ্রাম হোক বা শহর, এ রাজ্যের বাসিন্দাদের মাথা পিছু খরচ জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম।

এই পরিস্থিতি অস্বীকার করতে না পেরে কেউ কেউ বলছেন, অতি-ব্যস্ত সময়ে ভাড়া যথেষ্ট পরিমাণ বাড়লে ট্রেনে ভিড়ও খানিক কমতে পারে। এ এক আশ্চর্য মানসিকতা। ভিড় কমাতে বিদেশের মতো দু' মিনিট অন্তর ট্রেন চালানোর কথা তাঁদের মাথায় আসে না। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য এক এসেছে এ শহরে আজ। এ সব পণ্ডিতদের আক্ষেপ, কলকাতার মেট্রো রেল অসম্ভব রকম সস্তা। এখানে এখনও পাঁচ টাকায় টিকিট কাটা সম্ভব। তারা কখনও এমন বলেন না যে, শ্রমজীবী মানুষের মূল্য টিকিটের চেয়েও সস্তা। জীবিকার কারণে সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যে মানুষটাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হয় দিনে তার ৩০০-৪০০ টাকাও উপার্জন হয় না। সে রকম অগণিত মানুষের সংসার কীভাবে চলে তার খোঁজ ওইসব পণ্ডিতেরা রাখেন কি? অথচ, মূলত এদের দেওয়া টাকাতেই কলকাতা মেট্রো প্রতিদিন এক কোটির বেশি আয় করে। ফলে, লোকসানের গল্প শুনিয়ে কলকাতার জীবনরেখা স্বরূপ মেট্রোকে কিছু সাদা কলারের বাহন না করাই শ্রেয়।

সুব্রত দাস, দমদম

বহরমপুরে নাগরিক কনভেনশন

তিলোত্তমা খুন-ধর্ষণের বিচারের দাবিতে ৭ ডিসেম্বর বহরমপুর গ্রান্ট হলে এক মহতী গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ চিকিৎসক আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তনী ডাঃ শান্তনু ঘোষ প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক, আর জি কর-এর আর এক প্রাক্তনী ডাঃ আসিফ কামাল। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলার যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ কবিউল হক তিলোত্তমার হত্যা, স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতি ও সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব আন্দোলন

নিয়ে আবেগদীপ্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন নাট্যব্যক্তিত্ব সীমা সরকার, প্রবীণ অ্যাডভোকেট শ্যামলিমা সরকার, কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তনী শুভ্রশান্তি সিনহা, সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ধীরাজ কুমার সরকার, বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠক সমীর নাগ, সমাজকর্মী বিদেশ মণ্ডল প্রমুখ। বক্তারা বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে রাখার আবেদন রাখেন। লড়াই-এর পথে থাকার অঙ্গীকার করেন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের বিএসসি নার্সিং এর ছাত্রী আলিশা মণ্ডল। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন জেলার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ খালেদ নৌমান। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক বিপ্লব বিশ্বাস।

এ দিন 'ঝড়' পত্রিকার উদ্যোগে আর জি কর আন্দোলনের একটি সংকলন 'বিচার পথের সহযাত্রী'-র প্রচ্ছদ উন্মোচন করা হয়। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য প্রবীণ অধ্যাপক আবুল হাসনাত বক্তব্য রাখেন। আগামী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কমিটির প্রস্তাব করেন সমাজকর্মী স্নিগ্ধা সেন। কনভেনশনে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন নমিতা মণ্ডল, সুমন সরকার ও সুলেখা বসাক। 'তিলোত্তমা আমরা আজও হারিনি, তিলোত্তমা আমরা পথ ছাড়িনি'— এই দীপ্ত ঘোষণায় শহরের বিশিষ্ট নাট্যদল 'রণ' ফিনিক্স নাটকটি পরিবেশন করে। কনভেনশন থেকে স্পষ্ট হয়—সৌমিত্র বিশ্বাস থেকে তিলোত্তমা, ন্যায়বিচারের দাবিতে পথের লড়াই-ই শেষ কথা।

✦ বোলপুরে নাগরিক কনভেনশন

৩০ নভেম্বর বীরভূমের বোলপুর রোটারি ক্লাবে 'বোলপুর বহ্নিশিখা'-র আহ্বানে অভয়ার ন্যায়বিচার ও নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে আয়োজিত নাগরিক কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের কোষাধ্যক্ষ ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সংগঠক ডাঃ স্বপন বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন ডাঃ কার্তিক নসিপুরী, ডাঃ সুমন মিশ্র, ডাঃ ভবরঞ্জন শিকদার, ডাঃ সুস্মিতা বিশ্বাস। কনভেনশনে অধ্যাপক বিজয় কৃষ্ণ দলুই সহ বোলপুর শান্তিনিকেতনের বিশিষ্টজনেরা সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন অংশের একশোর বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে ডাঃ ভবরঞ্জন শিকদারকে সভাপতি করে কোর কমিটি গঠন করা হয়।

✦ বাঁকুড়ায় গণকনভেনশন

৭ ডিসেম্বর অভয়ার ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে বাঁকুড়াতে অনুষ্ঠিত গণকনভেনশনে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং নাগরিক সমাজের শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক নীলাঞ্জন কুণ্ডু।

বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ সজল বিশ্বাস, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নদীয়াইন্দু বিশ্বাস, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের জেলা সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন দরিপা, ডাঃ সুভাষ মণ্ডল, ডাঃ অরিত্র ভাণ্ডারী, আইনজীবী সৌমী চক্রবর্তী প্রমুখ। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সুবোধ সিংহ এবং পরিচালনা করেন শিক্ষক রঞ্জিত মাহাতো। পাশাপাশি সমাজ জুড়ে ক্রমবর্ধমান শিশু ধর্ষণ, নারী ধর্ষণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

✦ মেছেদায় কর্মীসভা

২১ জানুয়ারি কলকাতায় মহামিছিলের প্রস্তুতিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির উদ্যোগে ১১ ডিসেম্বর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় মেছেদার বিদ্যাসাগর হলে। মুখ্য বক্তা ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুরূপা দাস, কমল সাঁই, রাজ্য কমিটির সদস্য বিশ্বনাথ পড়িয়া ও জেলা সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি সহ নেতৃবৃন্দ।

● *অভয়ার ন্যায়বিচার, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রদের দাবিতে ২১ জানুয়ারি মহামিছিলের প্রস্তুতি উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় চালতাবেড়িয়া-বামুনগাছির কাশীপুর মোড়ে ১৪ ডিসেম্বর পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন দেড়শতাধিক মানুষ।*

৪২ হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব

জনগণের পকেটের টাকা পুঁজিপতিদের ভাণ্ডারে

চলতি আর্থিক বছরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪২ হাজার কোটি টাকারও বেশি অনাদায়ী ঋণ, হিসাবের খাতা থেকে মুছে দিয়েছে(রাইট অফ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। ৯ ডিসেম্বর লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানান কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। গত অর্থবর্ষেও (২০২৩-২৪) তারা মুছে দিয়েছিল ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকার বকেয়া। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই অঙ্ক ছিল ১.১৮ লক্ষ কোটি টাকা। গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে সব ব্যাঙ্কবকেয়া মুছেছে সেই তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ৮,৩১২ কোটি টাকার ঋণ মুছেছে তারা। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) ৮,০৬১ কোটি টাকা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ৬,৩৪৪ কোটি টাকা এবং ব্যাঙ্ক অব বরোদা ৫,৯২৫ কোটি টাকার বকেয়া ঋণ মুছে দিয়েছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির হিসাবের খাতা থেকে ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা মুছে ফেলা হয়েছে। (আর বি আই, সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা-১৫.০৪.২০২৪)

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির এই লাগাতার বকেয়া ঋণ মুছে দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। মুছে দেওয়া ঋণের সিংহভাগ যে এ দেশের ধনকুবের গোষ্ঠীদের নেওয়া ঋণ তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই টাকা আসলে সাধারণ মানুষের, যাঁদের কষ্টার্জিত অর্থে তিল তিল করে গড়ে ওঠে ব্যাঙ্কের আমানত। সেই আমানত থেকে যাবতীয় ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা জন্মায় ব্যাঙ্কগুলির। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে জমা টাকার পরিমাণ প্রায় ১১৮ লক্ষ কোটি, যার ৮০ শতাংশেরও বেশি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের। সেই টাকা এভাবে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধনকুবেরদের মধ্যে! এই ঘটনা ঋণখেলাপির প্রবণতাও বাড়িয়ে তুলছে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সব সময়ই কি এত উদার? একেবারেই তা নয়। সাধারণ গ্রাহকরা এক-দু লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে একটু দেরি করলে ব্যাঙ্ক তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। আদায়ের জন্য পিছনে পুলিশ লাগায়। কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতিদের বেলায় তাদের অন্য রূপ। হিসাবের খাতা থেকে ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা মুছে ফেলা হয়েছে। বকেয়ার যাবতীয় তথ্য উধাও করে দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাঙ্কের স্বার্থের বিনিময়ে কাদের স্বার্থ দেখছে ব্যাঙ্ককর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় সরকার তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলি এর ফলে যে আমানত হারাচ্ছে, তা পূরণ করতে প্রতিটি বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলির জন্য বরাদ্দ করছে। অথচ এই টাকা জনগণের উন্নয়নে কাজে লাগতে পারত। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বরাদ্দ করা যেত। অপর দিকে দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনমতো কর্মী নিয়োগ করে ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবার মান উন্নত করার কোনও প্রয়াস নেই। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'-এর খাঁড়া ঝুলিয়ে অল্প পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের থেকে যত বেশি সম্ভব কাজ আদায় করার প্রক্রিয়া পুরোদস্তুর বলবৎ রয়েছে। গ্রাহক পরিষেবার মান ক্রমশ নিম্নগামী হলেও সাধারণ গ্রাহকদের পরিষেবা শুল্কের ক্ষেত্র এবং পরিমাণ বাড়িয়ে তাদের উপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে।

এ ভাবে ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ বা অনাদায়ী ঋণ খাতা থেকে মুছে দিয়ে হিসাবের খাতাকে আপাত পরিষ্কার দেখানোর পিছনে কোন হিসাব কাজ করছে? অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলছেন যে মুছে দেওয়া অর্থও আদায়ের চেষ্টা চলে। চলে, কিন্তু তাতে তো বড় অংশের টাকা অনাদায়ীই থেকে যায়! আসলে মুছে দিয়ে ব্যাঙ্কের খাতা কিছুটা পরিষ্কার রাখলে সেই ব্যাঙ্ক কিনতে আগ্রহী হবে ক্রেতারা। কোন ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করতে এ হেন পদক্ষেপ? ধনকুবের যে পুঁজিমালিকরা যারা ঋণ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ করছে না, তারাই এ সব ব্যাঙ্কের সরকারি শেয়ার কিনে ব্যাঙ্কের মালিক হবে। সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত বিপুল অর্থ-লগ্নির নিয়ন্ত্রক হবে তারাই। সে কারণেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির এ জাতীয় পদক্ষেপে ধনকুবেরদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের পূর্ণ সম্মতি দেখা যাচ্ছে।

এই পথেই নতুন করে দেশের সাধারণ মানুষের সম্পদ ধনকুবেরদের সিন্দুকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। এই ঘটনা আবারও নগ্নভাবে দেখাচ্ছে সরকার এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উভয়েরই লক্ষ্য সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীতে গিয়ে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ, যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ব্যাঙ্ক কর্মচারী সহ সমস্ত সাধারণ মানুষকে।

জীবনাবসান

দলের ক্যানিং সাংগঠনিক জেলায় গোপালপুর হাটপুকুরিয়া লোকালের প্রবীণ সদস্য ও চাষি আন্দোলনের লড়াকু সৈনিক কমরেড সাম্মাদ জামাদার বার্ধক্য জনিত কারণে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৯ নভেম্বর গোপালপুর জামাদার পাড়ায় তাঁর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশিষ্ট কৃষক নেতা শহিদ কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দের হাত ধরে কমরেড সাম্মাদ জামাদার সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে যোগ দেন। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান হলেও গরিব কৃষক-খেতমজুরদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও অসীম ভালোবাসা। তিনি গরিব মানুকে সাথে নিয়ে তৎকালীন জোতদার জমিদারের বিরুদ্ধে লড়ে বহু খাস ও বেনাম জমি দখল করে গরিব খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। এই লড়াইয়ে তাঁর ভাই শহিদ হয়েছিলেন। তবু তিনি হাল ছাড়েননি। সাত এবং আটের দশকে তিনি বহুবার কারাবাস করেছেন। তিনি বহুবার কংগ্রেস ও সিপিএমের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। একটা সময় তিনি প্রচণ্ড দারিদ্রে দিন কাটিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি দলের দায়দায়িত্ব পালনে সর্বদা অবিচল থেকেছেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থতার কারণে দলের কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু শয্যাশায়ী হয়েও দলের আদর্শ ছিল তাঁর মননে ও হৃদয়ের গভীরে।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু এবং দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার, এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ সহ স্থানীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রয়াত কমরেড সাম্মাদ জামাদারকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান।

তাঁর মৃত্যুতে দল একজন আপসহীন সংগ্রামী সহযোদ্ধাকে হারাল।

কমরেড সাম্মাদ জামাদার লাল সেলাম

সমতলে সমীক্ষার ফরমান

তিনের পাতার পর

সমাজে রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ রূপে বিচারবিভাগের ভূমিকা কখনও নিরপেক্ষ হতে পারে না। অন্য স্তম্ভগুলির মতোই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে এবং শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় বিচারবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অবশ্য মানুষ যাতে বিচারব্যবস্থার প্রতি একেবারে আস্থা হারিয়ে না ফেলে তার জন্য মাঝে মাঝে জনগণের পক্ষেও কিছু কিছু রায় বিচারবিভাগ দিয়ে থাকে। এটা দেখিয়েই কর্পোরেট মালিকদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম নিপীড়িত মানুষকে বোঝায়— বিচারব্যবস্থাই তোমাদের শেষ আশ্রয়। তাদের উদ্দেশ্য প্রতিবাদের রাস্তায় যাওয়া থেকে মানুষকে বিরত করা। সমতলে পাঁচজন মানুষের রক্তের দাগ সহজে মোছার নয়। সেখানে যে বিভেদ, দাঙ্গা, হানাহানির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার প্রতিষেধক কী? খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য বিনষ্টকারী সমস্ত অপচেষ্টা রুখে দিতে জনজীবনের সমস্যা নিয়ে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনই এই ধরনের হীন কাজের সামনে প্রতিরোধ তৈরি করতে পারে।

শিশু নির্যাতন কমছে কই

তিনের পাতার পর

এমন পরিবেশ তৈরি করুন যাতে শিশু নিজের সমস্যার কথা বলতে পারে। আর এমন কিছু ঘটলে তা চেপে না গিয়ে পুলিশের কাছে যান।' যে কোনও শিশু বড় হয় শুধু পরিবারে নয়, সামাজিক পরিমণ্ডলে। সেই সমাজ পরিমণ্ডলই যদি কলুষিত হয়, অপরাধ প্রবণতা যদি উত্তরোত্তর বেড়েই চলে তাহলে শিশু খেলার মাঠেও যেমন, তেমনই পরিবারের সদস্যদের থেকেও নির্যাতিত হতে পারে। সমীক্ষা বলছে পরিবারের সদস্য ও শিশু দেখভালকারীদের দ্বারা বহুক্ষেত্রে শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলি ঘটছে। ফলে অভিভাবকরা সচেতন হলেও সব সময় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব নাও হতে পারে। গোটা সামাজিক ব্যবস্থাটার যে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, তা করবে কে? মোবাইল-টেলিভিশন-পত্রপত্রিকায় অশ্লীল ছবি ও বিজ্ঞাপন, মদ ও মাদকদ্রব্যের ঢালাও লাইসেন্স, শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক ধ্বংস সাধন, মূল্যবোধের অবক্ষয়— যে দলই যখন শাসন ক্ষমতায় থেকেছে এগুলিকে তারা নিশ্চিত করেছে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে।

এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক গতিতে অপরাধ মনন তৈরি করা হয়েছে সমাজের বুকে। বিকৃতি এতটাই যে ছয় মাসের শিশু কন্যা থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা এ সমাজে নিরাপদ নয় কেউই। আর এইসব অপরাধীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাসকদলের মদতপুষ্ট। শাসক দল ও অপরাধীদের এই ঘনিষ্ঠ বৃত্ত ভাঙতে চাই জনগণের সংগঠিত সচেতন সক্রিয় প্রতিরোধ।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি গণআন্দোলনের তরঙ্গ কেমন করে শাসকদলের বৃত্তে থাকা দুষ্টচক্রের কাউকে কাউকে অন্তত পক্ষে আইনের হেফাজতে নিয়ে আসাকে সম্ভবপর করেছে, জুনিয়র ডাক্তারদের বেশ কয়েক দফা দাবি মানতে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেছে। সহস্র ছিদ্রে ভরা এই সামাজিক ব্যবস্থাকে আন্দোলনের তরঙ্গে তরঙ্গে যদি উত্তাল করে দেওয়া যায় তার একটা অবশ্যম্ভাবী চাপ এসে পড়ে পুলিশ-প্রশাসন, সরকার ও বিচারব্যবস্থার উপর। আবার আন্দোলন তৈরি করে নতুন নৈতিকতা, উন্নততর সংস্কৃতি। ধসে পড়া সামাজিক মননের মানটাকে তা অনেকখানি তুলে আনতে সাহায্য করে। সচেতন জাগ্রত জনচেতনা চাপ তৈরি করে অপরাধ মননের উপরেও। তাই নির্বাচনসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির কোনও বাগাড়ম্বর বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে, শত ফুল বিকশিত করার জন্য সামাজিক এই ব্যবস্থাটাকে পরিবর্তনের দায়িত্ব জনসাধারণকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 19 Bengali Weekly December 20, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

উত্তরপ্রদেশে এসইউসিআই(সি) নেতা-কর্মীদের ওপর বিজেপির দুষ্কৃতীদের হামলা

পট্টী প্রতাপগড়ের উপ-জেলাশাসকের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে রাজ্যপালের উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপি পেশ করতে ১০ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্য সহ বেশ কিছু নেতা-কর্মী উপজেলাশাসকের দফতরে গিয়েছিলেন। সেখানে যখন স্মারকলিপিটি পাঠ করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় আগে থেকে জমায়েত হওয়া বিজেপির সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু দুষ্কৃতী অতর্কিতে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও মারধর করে। তারা স্মারকলিপি জমা দিতে বাধা দেয়। পুরো ঘটনায় পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। পরে ই-মেল মাধ্যমে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

এই ঘটনার নিন্দা করে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জগন্নাথ বর্মা এক প্রেস বিবৃতিতে প্রশাসনের কাছে এর সঙ্গে যুক্ত বিজেপি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি তিনি সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

বিধাননগরে শিক্ষা কনভেনশন ঃ অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির বিধাননগর শাখার উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর সল্টলেকে আইপিএইচই হলে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাত দত্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। বাসন্তী দেবী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মৈত্রেয়ী বর্ধন রায় ও অধ্যাপক প্রভাত দত্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। জাতীয় শিক্ষানীতি ও রাজ্য শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিলের দাবি ওঠে। অধ্যাপক প্রভাত দত্তকে সভাপতি ও উমা পণ্ডাকে সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়।

কেন্দ্র-রাজ্য যোগসাজশে দুই অভিযুক্তের জামিন

চারের পাতার পর

ফেলে দেওয়ার আন্দোলনে পরিণত করে ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করা যাচ্ছে না, তখনই তারা গোটা আন্দোলন থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন। এমন কি বিজেপি নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ রাজ্যে এলে নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তিনি দেখা করেননি। এমনকি তাঁর বক্তৃতায় এক বারের জন্যও এই ঘটনার উল্লেখ করেননি। জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্বশীল হলে কোনও দল কি জনস্বার্থবাহী কোনও আন্দোলন থেকে এ ভাবে হাত গুটিয়ে নিতে পারে! আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দাবি আদায় হোক, অপরাধীরা সাজা পাক, তা আসলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা চান না। তা না হলে তাঁরা সিবিআইকে স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে দিতেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে আজ মহিলাদের ধর্ষণ-খুন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ রাজ্যে আর জি কর আন্দোলন যদি অভয়ার ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠবে এবং শাসক হিসাবে বিজেপি বিপদে পড়বে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সিবিআইয়ের এই হাত গুটিয়ে নেওয়া আসলে কেন্দ্রীয় নির্দেশেই।

এই নির্দেশের দ্বারা কারা লাভবান হল? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকা কাদের স্বার্থ রক্ষা করল? বাস্তবে এর দ্বারা রাজ্য জুড়ে ধর্ষকরা, খুনিরা, দুর্নীতিগ্রস্তরা আরও বেপরোয়া হবে, তারা আরও বেশি করে সরকারি দলের ছাতার তলায় আশ্রয় নেবে। অন্য দিকে ধর্ষণ-খুনের মতো অপরাধ আরও বাড়তে থাকবে। সমাজ জুড়ে নৈরাজ্য বাড়বে। অপরাধীরা বুঝবে সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থাকলে যত অপরাধই তারা করুক না কেন, পুলিশ তাদের টিকিও ছোঁবে না।

মানুষ লড়বে বাঁচার স্বার্থেই

কিন্তু এর দ্বারা জনগণ, যারা রাস্তায় নেমে ন্যায় বিচারের দাবিতে লড়াই করেছেন, তাঁরা কি মনোবল হারাবে? মোটেও নয়। তাঁরা আজও আন্দোলনেই রয়েছেন। আজ এ কথা সবাইকে বুঝতে হবে যে, এ এক অসম লড়াই। একদিকে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, সমস্ত শাসক দলগুলি, আর অন্য দিকে ন্যায়বিচার প্রার্থী জনগণ এবং চিকিৎসক-ছাত্রছাত্রীরা। আন্দোলনের চাপে ইতিমধ্যেই সরকার হাসপাতালগুলিতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। আজ যদি আমাদের মেয়েদের একই রকম ধর্ষণ-খুনের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, ছেলেদের ধর্ষক হওয়ার পরিণতি থেকে রক্ষা করতে হয়, সমাজকে দুর্নীতির হাত থেকে, থ্রেট সিন্ডিকেটের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয় তবে আন্দোলনকে আরও সংগঠিত, আরও তীব্র করা ছাড়া জনগণের সামনে অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই। দুই দুষ্কৃতীর জামিন পাওয়ার ঘটনায় প্রবল ক্ষুব্ধ মানুষ সেই রাস্তাতেই হাঁটা মনস্থ করেছে। বিচার না পেলে তারা কাউকে ছাড়বে না।

আবাস যোজনায় দুর্নীতি
নন্দীগ্রামে বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

সব গরিব মানুষের নাম আবাস তালিকাভুক্ত করা, সব মৌজায় জলনিকাশি ও সেচের ব্যবস্থা, বন্ধ হয়ে যাওয়া বাস পরিষেবা চালু, স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণ, নন্দীগ্রাম রেল প্রকল্প রূপায়ণ, জমিহারাদের ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং নন্দীগ্রাম-হলদিয়া ফেরি সার্ভিসের নতুন

সময়সূচি রূপায়ণের দাবিতে নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসে ১২ ডিসেম্বর বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি। বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ সভায় আবাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস মনোজ দাস, অসিত জানা, অসিত প্রধান, বিমল মাইতি প্রমুখ।

পাঁশকুড়ায় সেচ দপ্তরে কৃষক বিক্ষোভ

অবিলম্বে কোলাঘাট ব্লকের দেহাটি, দেনান, গাজই সহ সমস্ত নিকাশি খালগুলি পূর্ণ সংস্কার, কংসাবতী নদীর ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ দ্রুত পাকাপোক্তভাবে মেরামত সহ ময়না রামচন্দ্রপুর থেকে মাইশোরা পর্যন্ত অংশ আগামী

বর্ষার আগেই সংস্কার, অতি সত্বর দেনান-দেহাটি জলনিকাশি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সহ ১০ দফা দাবিতে ১৩ ডিসেম্বর দুই শতাধিক কৃষক পাঁশকুড়া সেচ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন।

কৃষক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ওই কর্মসূচি থেকে সেচ দপ্তরের পাঁশকুড়া-১ ও ২ সাব ডিভিশনের এস ডি ও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা পাঁশকুড়া বাজার যাত্রী প্রতীক্ষালয় থেকে মিছিল করে সেচ দপ্তর অভিযান করেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি মধুসূদন বেরা। এসডিও সেচ জানান, ভেঙে যাওয়া কাঁসাইয়ের নদীবাঁধ পূর্ণাঙ্গভাবে মেরামতের বিষয়ে ডিপিআর করে পাঠানো হয়েছে।

নদিয়ার মদনপুরে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

৮ ডিসেম্বর নারায়ণ চ্যাটার্জী স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে মদনপুর সাধারণ পাঠাগারে আয়োজিত হল তৃতীয় দফায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম প্রায় ১০০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, ইসিজি পরীক্ষার পাশাপাশি রোগীদের ওষুধ সরবরাহ করা হয়। মধ্যবয়স্ক মহিলাদের হাঁটু এবং কোমরে ব্যথার সমস্যা সমাধানে জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তন সম্পর্কে চিকিৎসকরা তাদের প্রশিক্ষণ দেন। শ্বাসকষ্ট ও ডায়াবেটিক রোগীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এই উদ্যোগে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com